অলোক মিত্র

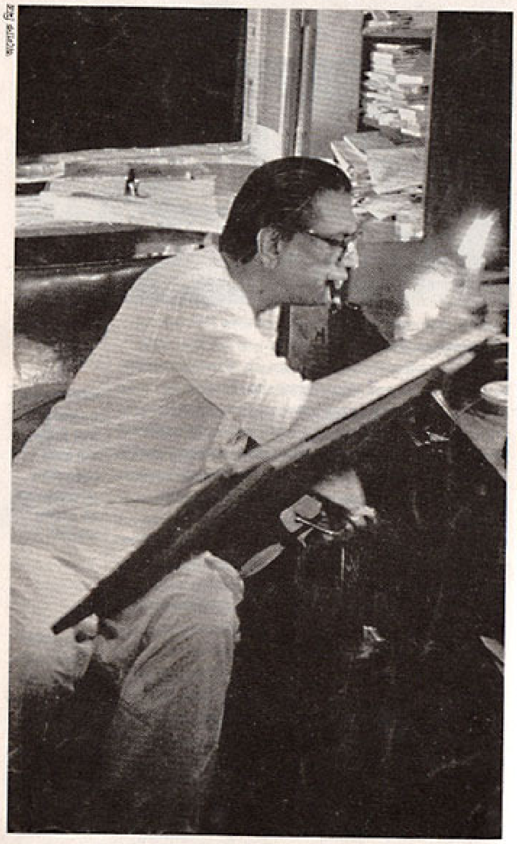

সত্যজিৎ রায় চাইলে অবশ্যই একটা পরিপূর্ণ সিম্ফনি লিখে ফেলতে পারতেন। কিন্তু উনি শুধুমাত্র নিজের চলচ্চিত্রের জন্য গান ও আবহসংগীত লিখে গেছেন। তাঁর সংগীতভাবনার প্রস্তুতিপর্ব, বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই গ্রন্থে। লিখছেন **গৌতম ঘোষ**।

সত্যজিৎ রায়ের সংগীত-বীক্ষা

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর চার বছর পরে আমি একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলাম। নাম RAY। বিজয়া রায় ও সন্দীপ রায় আমাকে ওঁর কাজের ঘরের গবেষণা ও চলচ্চিত্রায়ণের অনুমতি দিয়েছিলেন। উনি যেমনটি ছেড়ে গিয়েছিলেন ঘরটা তখনও তেমনটি ছিল। লেখার কলম, আঁকার ব্রাশ, পিয়ানোর ওপরে নোটেশনের খাতা, এমনকী টেবিল ক্যালেন্ডারের সন-তারিখ পর্যন্ত। আমি প্রথমেই ঘাঁটতে শুরু করলাম মানিকদার আশ্চর্য খেরোর খাতা যেখানে উনি চিত্রনাট্য লিখতেন। শুধু চিত্রনাট্য নয়, খাতাগুলো ছিল মানিকদার নোটবুক, স্কেচবুক, ডায়েরি, গানের খাতা—এককথায় ওয়ার্কস্টেশন। চিত্রনাট্য লেখার সময় থেকেই হয়তো ছবির থিম মিউজিক বা মূল স্বরটি ওঁর মনে বাজত। 'অভিযান'-এর চিত্রনাট্যের গোড়ার দিকেই বাঁ দিকের পাতায় স্টাফ নোটেশনে একটা মিউজিক্যাল ফ্রেজ লেখা। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ওঁর অসংখ্য চিত্রনাট্যের খাতায়। এরকম টুকরো সাংগীতিক নোটস ছাড়াও মানিকদা সব চলচ্চিত্রের জন্য পূর্ণাঙ্গ নোটেশনের খাতা ব্যবহার করতেন। বেশির ভাগই স্টাফ-এ লেখা। আবার কখনও কখনও দেশীয় স্বরলিপি ব্যবহার করতেন। আমি চমকে গিয়েছিলাম সত্যজিৎ রায়ের নোটেশন দেখে। প্রাথমিক ফ্রেজ, হারমোনিক লাইনস, কাউন্টারপয়েন্টস সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিধৃত। উনি চাইলে অবশ্যই একটা পরিপূর্ণ সিম্ফনি লিখে ফেলতে পারতেন। কিন্তু উনি শুধুমাত্র নিজের চলচ্চিত্রের জন্য গান ও আবহসংগীত লিখে গেছেন। আর মাঝে মধ্যে বন্ধু জেমস আইভরি বা সহকারী নিত্যানন্দ দত্ত কিংবা ওঁর শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তর জন্য সংগীত রচনা করেছেন।

বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়
সুধীর চক্রবর্তী
গাঙচিল। কল-১১১
১৭৫.০০

সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকে পরিবেশ রচনা ও দৃশ্যের ভাব প্রকাশের জন্য নানা ধরনের গান ব্যবহার করেছেন।

উল্লেখ্য, পুস্তকের প্রারম্ভেই লেখক সুধীর চক্রবর্তী আক্ষেপ করেছেন, 'তাঁর সব ছবি ইচ্ছে করলে দেখা যায় না। যদিও তাঁর নামে কলকাতায় একটি মান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সরকারি বদান্যতায়, কিন্তু তা সর্বসাধারণের জন্যে কোনো অর্থেই সুগম্য নয়। সত্যজিৎ রায়ের সব ক'টি ছবির চিত্রনাট্য একসঙ্গে আমরা দুই মলাটের মধ্যে পেতে পারতাম, পাইনি। সত্যজিৎ-মানসের ব্যাপ্তি এতই বিশাল যে কোনো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে মাপা যায় না। বিভিন্ন দিক থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সত্যজিতের সৃষ্টিশীলতার গতিপথ বুঝতে হয়।' সুধীর চক্রবর্তী সত্যজিতের চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিশীলতার গতিপথের সন্ধান করেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের সংগীত-বীক্ষা ও চলচ্চিত্রে তার প্রয়োগের প্রসঙ্গে আসার আগে বাংলা ফিল্মের গানের সামগ্রিক চেহারা কী ছিল সে বিষয়ে পাঠককে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন। নির্বাক থেকে সবাক চলচ্চিত্রে সংগীত ও গানের ব্যবহার কীরকম ছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধটিতে।

বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহারের সঙ্গে মুম্বইয়ে নির্মিত কিছু হিন্দি ছবির প্রসঙ্গও এসেছে দৃষ্টান্ত হিসেবে। প্লে-ব্যাক পদ্ধতি উদ্ভাবনের পূর্বের ও পরের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। সুগায়ক-গায়িকারা অভিনয় না জেনেও চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা হতেন স্রেফ গানের গলার জন্য। সবাক যুগে বাংলা তথা সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রে গানই যে প্রধান জনপ্রিয় উপাদান ছিল তা অনেক দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য মননশীল লেখকদের উদ্ধৃতি যুক্ত হয়ে পাঠককে একটা সম্যক ধারণা দেয়। প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, হীরেন বসু মহাশয় প্লে-অ্যালং পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন, যাকে বলা যায় প্লে-ব্যাক পদ্ধতির প্রথম পর্যায়। প্লে-অ্যালঙে ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে থেকে কণ্ঠশিল্পী গান গাইতেন আর সেটার লিপ মেলাতেন নায়ক-নায়িকারা। এরপর আসে সঠিক প্লে-ব্যাক পদ্ধতি। আমরা এতদিন জানতাম নীতিনবাবুর 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে প্রথম প্লে-ব্যাক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন শব্দযন্ত্রী মুকুল বসু। অথচ সুধীরবাবু উল্লেখ করেছেন, মেহবুব খাঁ নির্দেশিত 'মনমোহন' ছবিতে প্রথম প্লে-ব্যাক পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। এইখানে একটু ধন্দ রয়ে গেল বা চলচ্চিত্র

> গান রচনা ও অভিনব সুরের প্রয়োগে সত্যজিৎ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে'র সংগীতের জন্য। লেখক জানাচ্ছেন, 'সত্যজিৎ রায়ের সাঙ্গীতিক সামর্থ্য ছবি দুটিতে চরম পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।'

> সত্যজিৎ তাঁর প্রথম ছ'টি চলচ্চিত্রে নিজে সুর রচনা করেননি। দায়িত্ব দিয়েছিলেন রবিশংকর, আলি আকবর প্রমুখ স্রষ্টাদের। সুধীরবাবু লিখেছেন, ওই ছবিগুলোতে 'সাঙ্গীতিক প্রয়োগ কিছুটা আরোপিত মনে হয়।' লেখকের এই উক্তির সঙ্গে আমি একমত নই।

ইতিহাসের গবেষকদের কাছে নতুন প্রশ্নের উদয় হল।

এই প্রবন্ধের শেষে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগ ও সত্যজিৎ এবং ঋত্বিকের সংগীত-বীক্ষার মধ্যে যে-বৈপরীত্য তা স্বল্প পরিসরে রসোদ্দীপ্ত আলোচনার মাধ্যমে চমৎকারভাবে নিবদ্ধ করেছেন।

পরবর্তী প্রবন্ধগুলোতে লেখক মূলত সত্যজিৎ রায়ের সংগীত নিয়ে আলোচনা করেছেন। সত্যজিতের সংগীতভাবনার প্রস্তুতিপর্ব, সংগীতচিন্তার বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত সমেত বিস্তারিত আলোচনা।

সত্যজিতের লেখা ও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা জানি যে, কৈশোর থেকে পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ ও নানা রেকর্ড শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ছোটবেলায় মামাবাড়িতে থাকাকালীন 'গ্রেগরিয়ান চান্ট'-এর একটা রেকর্ড তাঁকে আবিষ্ট করেছিল। আমি নিজে একবার আসিসি-র চার্চ থেকে সংগ্রহ করা 'গ্রেগরিয়ান চান্ট'-এর ক্যাসেট মানিকদাকে দিয়েছিলাম। খুব খুশি হয়ে ফ্রান্সিসকান মংক-দের এই আদি সংগীত নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ওই সংগীতের 'পেন্টাটনিক নেচার' নিয়ে আমাকে অবহিত করে বিশ্লেষণ করেছিলেন। আর তাঁর প্রিয় এই 'চান্ট' বহুদিন পরে 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন

পাশ্চাত্য সংগীতে সিদ্ধহস্ত সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রের আবহে ও গানে পাশ্চাত্য কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় রাগ ও লৌকিক সুরের অভিনব সমন্বয় সাধন করেছেন।

সংগীত পরিচালক সত্যজিৎ

চিত্রনাট্য লেখার সময় থেকেই হয়তো ছবির থিম মিউজিক বা মূল স্বরটি ওঁর মনে বাজত। 'অভিযান'-এর চিত্রনাট্যের গোড়ার দিকেই বাঁ দিকের পাতায় স্টাফ নোটেশনে একটা মিউজিক্যাল ফ্রেজ লেখা। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ওঁর অসংখ্য চিত্রনাট্যের খাতায়।

একটি বিশেষ মুহূর্তে। সুধীরবাবু সংগীত ব্যবহারে এই ধরনের অনুষঙ্গ চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর প্রবন্ধে।

সত্যজিৎ তাঁর প্রথম ছ'টি চলচ্চিত্রে নিজে সুর রচনা করেননি। দায়িত্ব দিয়েছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধকদের। রবিশংকর, আলি আকবর ও বিলায়েত খাঁর মতো স্রষ্টাদের। সুধীরবাবু লিখেছেন, ওই ছবিগুলোতে 'সাঙ্গীতিক প্রয়োগ কিছুটা আরোপিত মনে হয়।' লেখকের এই উক্তির সঙ্গে আমি একমত নই। 'পথের পাঁচালী'র থিম মিউজিক বা 'দেবী'র টাইটেল মিউজিক অথবা 'জলসাঘর' ছবির সামগ্রিক সংগীত অবিচ্ছেদ্যভাবেই ছবিগুলির বিষয়বস্তু ও দৃশ্যবিন্যাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

টুকরো
সাংগীতিক নোটস ছাড়াও মানিকদা সব চলচ্চিত্রের জন্য পূর্ণাঙ্গ নোটেশনের খাতা ব্যবহার করতেন।

সত্যজিৎ রায়ের সমস্যা হয়েছিল সাউন্ডট্র্যাকের টেকনিকাল দিক থেকে। বিশেষ একটা রচনার টাইমিং নিয়ে। যা লেখক পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। সিনেমার সংগীত নির্মাণ আদ্যন্ত functional এবং শব্দ পুনর্যোজনার সময়ে তার অভিঘাত কী হবে তার ওপরে নির্ভরশীল। খুব অঙ্ক কষে কম্পোজিশন ও যন্ত্রানুষঙ্গ তৈরি করতে হয়। একটা বিশেষ শট-এ শুরু ও শেষ। টেম্পো অনুযায়ী Bar-এ বিভক্ত করতে হয় এক-একটা পিস বা গানের অংশ।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারা পাশ্চাত্য সংগীত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একশোটা বেহালাকে টিউন করা সম্ভব, কিন্তু দশটা সেতারকে টিউন করতে কালঘাম ছুটে যাবে।

পলিফোনিক রচনার ব্যবহারিক সুবিধার জন্য পাশ্চাত্য সংগীতে সিদ্ধহস্ত সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রের আবহে ও গানে পাশ্চাত্য কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় রাগ ও লৌকিক সুরের অভিনব সমন্বয় সাধন করেছেন।

সুধীরবাবুর ভাষায়, 'সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্যাপারে আলাদাভাবে যে অভিজ্ঞতা ঘটে, তা মিশ্র ধরনের। তাঁর ছবিতে খাঁটি ভারতীয় রাগ-রাগিণী আছে, পাশ্চাত্য সুরকারদের প্রসিদ্ধ কিছু রচনার মনোজ্ঞ প্রয়োগ আছে আবার পুরনো ধাঁচের খাঁটি বাংলা গান ও বিশেষভাবে নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের চাতুর্যপূর্ণ নিগূঢ় প্রয়োগ আছে। এর বাইরে ছবির লোকেশান অনুযায়ী স্থানীয় লোকসঙ্গীতের, যেমন রাজস্থানি বা নেপালি, টুকরো ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।' 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সত্যজিৎ রায়' রচনায় সুধীরবাবু রায়-পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

সুরকার সত্যজিৎ

সম্পর্ক, সেই সাংগীতিক পরিমণ্ডলে সত্যজিতের বেড়ে ওঠা এবং পরবর্তীকালে তাঁর চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত-এর ব্যবহার বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকে পরিবেশ রচনা ও দৃশ্যের ভাব প্রকাশের জন্য নানা ধরনের গান ব্যবহার করেছেন। কাঙাল হরিনাথ রচিত 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসংগীতের টুকরো বা পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার, অতুলপ্রসাদের গান, রামমোহনের রচনা, দেশীয় টপ্পা-ঠুংরি, লোকসংগীত ও ভিক্টোরীয় ব্যালাড গান। গান রচনা ও অভিনব সুরের প্রয়োগে সত্যজিৎ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে'র সংগীতের জন্য। লেখক জানাচ্ছেন, 'সত্যজিৎ রায়ের সাঙ্গীতিক সামর্থ্য ছবি দুটিতে চরম পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এর গান বাংলা গানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং ফিল্মের গান কত রকম হতে পারে, কতভাবে প্রয়োগ করা যায়, কত সমৃদ্ধ গায়নে পরিবেশিত হতে পারে—সব কিছুর এখনো পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।'

তাঁর প্রিয়
এই 'চান্ট' বহুদিন পরে 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন একটি বিশেষ মুহূর্তে।

সুধীর চক্রবর্তীর এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে বলেই আমার ধারণা। লেখকের মনোজ্ঞ রচনার সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর সাক্ষাৎকার সুখপাঠ্য। একটি ভুল চোখে পড়ল, 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'র সুর 'মহানগর' ছবিতে নয়, 'চারুলতা'য় ব্যবহৃত হয়েছিল।

সুন্দর একটি গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য গাঙচিল প্রকাশনা সংস্থাকে ধন্যবাদ।